Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 123 –130
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' : একালের দ্রৌপদীর আত্মকথা

সত্যা দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
ইমেইল : satyadebnathmkg1990@gmail.com

Keyword
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দুঃশাসনীয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দুঃশাসন, দ্রৌপদী, আত্মকথা, ছোটগল্প, মহাভারত।

Abstract
Manik Bondyopadhay's (1908-1956) 'Dushasaniya' and Narayan Gangopadhyay's (1918-1970) 'Dushasana' are two stories written in the context of famine, depression, inflation, black market and above all, the terrible clothing crisis. Both the stories show how the tragic death of humanity in a society plagued by economic exploitation has created a distressing shortage of clothing.The names 'Dishasaniya' and 'Dushasana' are very similar. Dushasana means misrule or oppressive rule, and the mythological connection of Dushasana, the second son of Dhritarashtra of Mahabharata, also comes here. When Draupadi was disrobed in divan in Mahabharata, Krishna appeared and saved Draupadi's shame. In 1943-44 AD, the group of smuggling misrule took away the clothes of many Draupadis of Bengal. Adharma was destroyed by the religious war of Mahabharata, misrule died but now there are no more religious wars, and no one punishes misrule. No one comes forward like Shri Krishna and removes the shame of mothers and sisters. All around is the reign of bad breath. That extreme disrespect of womanhood is mentioned in Manik Bandopadhyay's 'Dushasaniya' and Narayan Gangopadhyay's 'Dushasana'. The story of the two stories is different but the context is the same. Although the horror of the cloth crisis is shown in 'Dushasaniya', a protesting voice is heard in the story, a murmur of resistance is heard in the story.

Discussion

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারি এবং সর্বোপরি যে ভয়াবহ বস্ত্রসংকট দেখা দিয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) 'দুঃশাসনীয়' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) 'দুঃশাসন' গল্প দুটি। অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের শোচনীয় অপমৃত্যু কীভাবে দুঃসহ বস্ত্রসংকট সৃষ্টি করে তুলল তাই দেখানো হয়েছে গল্প দুটিতে। 'দুঃশাসন' ও 'দুঃশাসনীয়' নাম দুটি খুবই ব্যঞ্জনাপূর্ণ। দুঃশাসন মানে যেমন কুশাসন বা নিপীড়নাত্মক শাসন আবার মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র দুঃশাসনের

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-12
Website: www.tirj.org.in, Page No. 123-130

পৌরাণিক অনুষঙ্গটিও এখানে এসে যায়। মহাভারতের দুঃশাসন প্রকাশ্য রাজসভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিল। ১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে চোরাকারবারী দুঃশাসনের দল বাংলার অসংখ্য দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল তারই কথা আছে আলোচ্য গল্প দুটিতে। মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ হয়ে অধর্মের বিনাশ হয়েছিল, দুঃশাসনের মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু এখন আর ধর্মযুদ্ধ হয় না, দুঃশাসনদেরও কেউ শাস্তি দেয় না। শ্রীকৃষ্ণের মতো এগিয়ে এসে মা-বোনদের লজ্জা নিবারণও কেউ করে না। চারিদিকে শুধুই চলে দুঃশ্বাসনের রাজত্ব। নারীত্বের সেই চরম অসম্মানের কথাই পাই মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পে। গল্পদুটোর কাহিনি আলাদা কিন্তু প্রেক্ষাপট এক। 'দুঃশাসনীয়'তে যেভাবে বস্ত্রসংকটের ভয়াবহতা দেখানো হয়েছে তুলনায় 'দুঃশাসন'এ কম হলেও গল্পে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়, প্রতিরোধের গুঞ্জন শোনা যায়।

তিন বন্দোপাধ্যায়ের অন্যতম মহারথী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত দিক থেকেই স্বতন্ত্র। তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ১৯ মে বিহারের দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের নিকট মালবদিয়া গ্রামে। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট। তিনি সেটেলমেন্ট বিভাগে চাকরি করতেন এবং শেষজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার, ‘মানিক তাঁর ডাকনাম।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের প্রথম পর্বে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড, ইয়ুং অ্যাডলার প্রমুখ দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তী সময়ে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হন এবং আমৃত্যু এই দলের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। সাহিত্যের মাধ্যমে মার্ক্সের শ্রেণিসংগ্রামতত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং মানুষের মনোরহস্যের জটিলতা উন্মোচনে তিনি ছিলেন একজন দক্ষশিল্পী। শহরের পাশাপাশি গ্রামজীবনের দ্বন্দ্বসঙ্কুল পটভূমিও তাঁর উপন্যাস ও গল্পে গুরুত্ব পেয়েছে। অর্ধশতাধিক উপন্যাস ও দুশো চবিবশটি গল্প তিনি রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থঃ ‘জননী’ (১৯৩৫), ‘দিবারাত্রীর কাব্য’ (১৯৩৫), ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ (১৯৩৬), ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ (১৯৩৬), ‘শহরতলী’ (১৯৪০-৪১), ‘চিহ্ন’ (১৯৪৭), ‘চতুষ্কোণ’ (১৯৪৮), ‘সার্বজনীন’ (১৯৫২), ‘আরোগ্য’ (১৯৫৩) প্রভৃতি। আর ছোটগল্প গ্রন্থ 'অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫), 'প্রাক ঐতিহাসিক' (১৯৩৭), 'হলুদ পোড়া' (১৯৪৫), 'আজকাল পরশুর গল্প'(১৯৪৬), ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প’ (১৯৫০), ‘ফেরিওয়ালা’ (১৯৫৩) ইত্যাদি। পদ্মানদীর মাঝি ও পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাস দুটি তাঁর বিখ্যাত রচনা। এ দুটির মাধ্যমেই তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনায় মানুষের অন্তর্জীবন ও মনোলোক বিশ্লেষণে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে মানুষের অবচেতন মনের নিগূঢ় রহস্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর পরবর্তী রচনায় তাঁর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা নাগরিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর এ পর্যায়ের রচনায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছেন, তা সত্ত্বেও তিনি সাহিত্যচর্চাকেই পেশা হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন। এক সময় তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর জন্য সাহিত্যিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এসব কারণে দারিদ্র্য মানুষের স্বভাবে কী পরিবর্তন আনে, বিশেষত যৌনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উদরপূর্তি কী সমস্যার সৃষ্টি করে তার একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে।

তিনি কখনো ফ্রয়েডপন্থী, কখনো বিশুদ্ধ কল্লোলীয়, কখনো অবক্ষয়ী আবার কখনো বা নিছক মার্কসবাদী। ১৩৩৫ সালের পৌষ সংখ্যায় মাসিক ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প ‘অতসীমামী’ প্রকাশিত হয়। সেই সময় লেখকের বয়স মাত্র কুড়ি। তারপর একের পর এক তাঁর অসংখ্য ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। বাংলা ছোট গল্পের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প দান করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এর যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। দুবার তিনি এ সঙ্ঘের সম্মেলনে সভাপতিত্বও করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াসে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য

সম্মেলনের গণসাহিত্য শাখায় এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ আয়োজিত জোসেফ স্টালিনের শোকসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু। তাঁর 'দুঃশাসনীয়' গল্প সম্পর্কে প্রাবন্ধিক শুক্লা ঘোষ চৌধুরী বলেছেন -

> "অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত সমাজব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের শোচনীয় অপমৃত্যু দুঃসহ বস্ত্রসংকট প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তিনি কতকগুলি অসাধারণ গল্প লিখেছিলেন। এই রকমই একটি উৎকৃষ্ট গল্প হল 'দুঃশাসনীয়'।"[১]

গল্পটি ১৩৫০ -এর বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে লিখিত হলেও গল্পের মূল বিষয় তখনকার ভয়ংকর বস্ত্রসংকট। ব্যবসায়ীরা কালোবাজারি সৃষ্টি করে, সব জিনিসেরই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি তৈরি করে। সব জিনিসের মতো কাপড়ও একসময় দুর্লভ হয়ে গেল। প্রথমে গামছা, পরে বস্তা চট পড়ে নারীরা বাইরে বের হত আর অবশেষে যখন কিছুই জুটলো না তখন নারীরা হয়ে গেল নিশাচর। রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে তারা প্রয়োজনীয় কাজটুকু করে নেয়। দিনের আলোতে বেড়ানোর জন্য একফালি ন্যাকড়াও তাদের যখন থাকল না তখনই বাধ্য হয়ে নারীরা রাতের অন্ধকারে ছায়া হয়ে গেল। নারীর কায়া যেন ছায়া হয়ে গেল। লেখকের কথায় –

> "কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে এক ফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘড়া, কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।"[২]

গরিব চাষী, মজুরের বউরা দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে অনাহারে দিন কাটিয়েছে, শাকপাতা খুদ কুঁড়ো দিয়ে তারা প্রাণ বাঁচানোর লড়াই করেছে। কিন্তু আজ তারা লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো কাপড় না পেয়ে সবাই মরণ কামনা করেছে। বাবা-ভাই-স্বামী-শ্বশুরের সামনে কেউ বের হতে পারে না। গল্পে লক্ষ্যণীয় ভুতির বারো বছরের ছেলে কানুর সামনে নগ্নদেহে ভূতি যেতে পারে না, ছেলের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে সে। অথচ আমরা দেখি সুরেন ঘোষ ও আব্দুল আজিজ লরি ভর্তি কাপড় নিয়ে জনতার সামনে দিয়ে চলে যায় যারা একটুকরো কাপড়ের আশায় অপেক্ষা করছিল।

> "হতাশ ম্রিয়মাণ জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝাই প্রকাণ্ড এক লরি রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদের সামনের রাস্তা সেই মোড়ে। ...থামতে থামতে আবার গর্জন করে লরিটা জোরে গিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।"[৩]

জনতা এক টুকরো কাপড়ও পায় না, গাড়ি গাড়ি কাপড় চলে যায়, কাপড়ের কালোবাজারি করে সুরেন ঘোষ ও আব্দুল আজিজের মতো লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেয় আর শাসনকর্তার প্রতিনিধি সুদেনের মতো নরপিচাশরা মা-বোনদের নগ্নদেহের সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ায়।

একটি কাপড় নিয়ে নিজের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে গোকুলের বোন মালতী, দাশু কামারের মেয়ে তাদের ইজ্জতকে তুলে দেয় বিপনি সামন্তের মতো মানুষের হাতে। খালি গুদামে শত শত বান্ডিল কাপড় পড়ে আছে অথচ গ্রামের গরীব মা-বোনদের এক টুকরো কাপড় কেন জোটে না - এই প্রশ্ন করলেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে চলে যেতে হয় জেলে। গ্রামের জন্য বরাদ্দ কাপড় ডিলাররা দারোগা-পুলিশের সহায়তায় বাইরে পাচার করে দেয় চড়া দামে। এই কালোবাজারির খেসারত দিতে হয় গরিব মা-বোনদের।

আনোয়ারের স্ত্রী রাবেয়া বিশ্বাস করতে পারে না যে দেশে কাপড় নেই। রাবেয়া স্বামীকে দায়ী করে, সে ভাবে তার স্বামী একটি কাপড় জোগাড় করতে অপারগ। রাবেয়া প্রশ্ন করে –

> "কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ির মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পড়ে কী করে? আজিজ সাহেবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলায় মোটা আবরণ পায় কোথায়।"[৪]

রাবেয়ার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না তার স্বামী। শত চেষ্টা করেও রবের স্বামী রাবেয়ার জন্য একটিও কাপড় জোগাড় করতে পারেনা। বিবিকে কাপড় দিতে পারেনা ফলে এমন স্বামীর সাথে আর শোবেনা বলে রাবেয়া অন্ধকার রাতে পুকুরের জলের নিচে পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল। রাবেয়ার এই আত্মহত্যা আপাত দৃষ্টিতে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিমানের প্রকাশ বলে মনে হলেও তা আসলে নরপিচাশ, অমানবিক সেই সব মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যারা অর্থের লোভে বাংলার মা বোনদের লজ্জা নিবারণের শেষ বস্ত্রটাও কেড়ে নিয়েছে। মহাভারতের দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করেছিল

দুঃশাসনের রক্ত দিয়ে সে চুল রঞ্জিত করবে, তার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছিল কিন্তু আজকের দুঃশাসনের বধ দূরে থাক দুঃশাসনের বস্ত্রহরণের প্রতিবাদ করতেও সাহস পায় না এই অসহায় গরীব মানুষগুলো। রাবেয়ার মতো সামান্য নারী তার জীবন দিয়ে প্রতিবাদ করলেও সেই প্রতিবাদ সমাজের দুঃশাসন পর্যন্ত পৌঁছায় না। সমস্যা সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই, গল্পে নেই কোনো প্রতিকারের পথ। লেখক আত্মহত্যার ঘটনা দিয়ে কাহিনি সমাপ্ত করেছেন এবং রাবেয়ার এই করুণ পরিণতির জন্য যারা দায়ী তাদের কঠিন শাস্তি বিধানের দাবিও যেন করেছেন ভাষাহীন ইঙ্গিতে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য তাঁর কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থে বলেছেন –

> "আসলে এই জাতীয় গল্পে সমস্ত নারী-ই রাবেয়া, সকলেরই তারই মতো অনিবার্য পরিণতি। অভিমানিনী রাবেয়ার আত্মহত্যা কেবল স্বামীর ব্যর্থ পৌরুষের প্রতি ধিক্কার নয়, এই হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র ধিক্কারও বটে। সমস্যার প্রতিকারের কোনো প্রকাশ্য ইঙ্গিত গল্পে নেই, কিন্তু যারা রাবেয়াদের এই করুণ পরিণতির জন্য দায়ী তাদের কঠিন শাস্তি বিধানের অনুক্ত দাবিও যেন এর মধ্যে দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়েছে।"[৫]

সমাজের দুঃশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে যে নারীরা আপাতদৃষ্টিতে লজ্জা নিবারনের জন্য তারা কাপড় পেয়েছে কিন্তু সত্যিকারের লজ্জা নিবারণ তাদের হয়নি। দেহ বিক্রয় করে মালতী বেনারসি শাড়ি পরলেও বিপিন সামন্তের পিছন পিছন তাকে যেতে হয় কোনো অন্ধকার কুঠুরিতে। সেখানেও চলে তার বস্ত্রহরণ। লজ্জা রক্ষার জন্য দেহ বিক্রি করেও সেই নারীদেরও বস্ত্রহরণ করেছে দুঃশাসনের দল। হাতিপুরের মেয়েদের এই করুণ পরিণতির কথাও গল্পকার তুলে ধরেছেন গল্পে কিন্তু এটা বোঝাই যায় এটা শুধু হাতিপুরের কথা নয়, এটা সারা বাংলার কথা। গল্পটি শুধু হাতিপুরের মেয়েদের রাতের অন্ধকারে ছায়া হয়ে যাওয়ার কাহিনি নয়, সারা বাংলার মেয়েদের ছায়া হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত।

> "ডোবা পুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইরে ছায়ার সঙ্গে, দিদি মাসি খুড়ি বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে, অভিশাপ দেবে অদৃষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে যাবে এদিক ওদিকে এ কুঁড়ের ও কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে।"[৬]

এমন করুন অথচ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা সমগ্র বাংলা সাহিত্য বিরল দুঃশাসনের দল মেয়েদের রাতের ছায়া করে দিয়েছে বস্ত্র কেড়ে নিয়ে ছায়া দিনের বেলা সবার সামনে বের হতে চাইলেও বের হতে হবে বিক্রি করে আর এই ছায়া জীবন থেকে নিঃশর্ত মুক্তি চাইলেও করতে হবে রাবেয়ার মতো আত্মহত্যা।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। তবে শুধু কথাসাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস – ছোটগল্পই নয়, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একজন রোমান্টিক লেখক হিসেবে পরিচিত। নিসর্গ প্রকৃতি, ইতিহাস এবং মানবিক সম্পর্ক তাঁর লেখনীতে প্রাধান্য পেয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বঙ্গদেশের দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙিতে (বর্তমান বাংলাদেশে) তাঁর জন্ম হয়। তাদের আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলার বাসুদেবপুরের নামচিড়া গ্রাম। নারায়ণের পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পুলিশের উচ্চপদে চাকরি করতেন বলে তাঁর ছেলেবেলা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাটে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভরতি হলেও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তাঁকে শহর ছাড়তে হয়, কলেজের পরীক্ষাও দেওয়া হয় না। পরে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং সেখান থেকেই ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ডিস্টিংশন সহ বিএ পাস করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন এবং ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি (ডি ফিল) লাভ করেন ওখান থেকেই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাত্র-অবস্থা থেকেই সাহিত্য রচনা শুরু করেন। সমালোচক এবং সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি হল— উপন্যাস : 'উপনিবেশ' (৩য় খণ্ড, ১৯৪৪-১৯৪৭), 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৯৪৪), 'মন্ত্রমুখর' (১৯৪৫), 'মহানন্দা', 'স্বর্ণসীতা', 'নিশিযাপন', 'শিলালিপি', 'ট্রফি', 'লালমাটি', 'কৃপক্ষ',

'বিদূষক', 'বৈতালিক', 'অসিধারা', 'ভাটিয়ালি', 'পদসঞ্চার', 'অমাবস্যার গান', 'আলোকপর্ণা'। ছোটগল্পগ্রন্থ : 'গল্পসংগ্রহ', 'সাপের মাথায় মণি', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'স্বনির্বাচিত গল্প'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'আনন্দ' পুরস্কার পান। বসুমতী পত্রিকার পক্ষ থেকে সংবাদ-সাহিত্যের প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁকে (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ), আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণপদক দেওয়া হয় মরণোত্তর সম্মান রূপে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

বিশ শতকের তিরিশের দশকের তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের যথার্থ উত্তরসূরী হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের মন্বন্তর, মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজারি প্রেক্ষাপটে লেখা। গল্পটি সম্পর্কে প্রাবন্ধিক সুস্মিতা ঠাকুর বলেছেন –

> "যুদ্ধ, মন্বন্তর, মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজারি প্রেক্ষাপটে নিরন্ন, বস্ত্রহীন বাংলার এক অভিশপ্ত স্মৃতি বয়ে আনছে 'দুঃশাসন' গল্পটি। ...সেই চেতনাশূন্য মনুষ্যত্ব লুপ্ত বর্বর দুঃশাসন যেন আবার তার পাশবিক অস্তিত্ব নিয়ে বাংলার বস্ত্রহরণে উদ্যত হয়েছে। দুঃশাসন গল্পটি যেন সেই পৌরাণিক প্রসঙ্গের গর্ভ থেকে অগ্নিবলয় ছড়িয়ে উঠে এসেছে।"[৭]

১৩৫৬ বঙ্গাব্দে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে শ্রেষ্ঠগল্প প্রকাশিত হয় 'দুঃশাসন' গল্পটি তারই অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া মিত্র ও ঘোষের নারায়ণ রচনাবলীর দ্বিতীয় খন্ডে গল্পটি রয়েছে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পের মতো এই গল্পেও বস্ত্র সংকটের ভয়ঙ্কর ছবি না থাকলেও একটি দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পকার সেই ভয়াবহতাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গল্পের মূল চরিত্র দেবীদাস, গল্পকার দেবীদাস সম্পর্কে বলেছেন –

> "ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দরে বড় ব্যবসায়ী কাপড়ের আড়তদার সে। আশেপাশের আট দশ খানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে।"[৮]

যুদ্ধের সময় ও পরে মুদ্রাস্ফীতি যখন চরমে তখন ব্যবসায়ী ইরা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল কালোবাজারি করে। সাধারণ গরিব মানুষদের কথা ভাববার সময় তাদের নেই। দেবীদাস এই কালোবাজারিদের একজন। সাধারণ মানুষ একটি বস্ত্রের জন্য তার পা ধরে কাঁদলেও সে এক টুকরো কাপড়ও কাউকে দেয় না। লোভী স্বার্থপর কানু বস্ত্র ব্যবসায়ী সবাইকে বলে কাপড়ের চালান আসেনি যুদ্ধের জন্য। গরিব মানুষগুলো চোখের জল দিয়ে দেবীদাসী দাসের পা ধুয়ে দিলেও তার মন গলে না। দেবীদাসের আড়তে কাজ করে ভাইপো গৌরদাস। সে দেবীদাসের পা আঁকড়ে পড়েছিল একটি কাপড়ের জন্য। দেবীদাস গৌরদাসকে বলে –

> "ওকে একখানা কাপড় দিলে দু'ঘণ্টার মধ্যেই দোর গোড়ায় উল্টোচন্ডীর মেলা বসে যেতো না? ও বেটাদের কাছ থেকে এক পয়সাও তো আর বেশী নেবার উপায় নেই।"[৯]

দেবীদাসের সাথে থেকে থেকেও গৌরদাস এত লোভী পাষণ্ড হতে পারেনি, তার মনে একটু দয়া মায়া অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু সে তো গল্পের মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিনিধি, যার প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও সাহস হয় না, প্রতিবাদ করতে মন চাইলেও ভাবতে হয় অনেক কিছু।

কালোবাজারির এই রমরমা ব্যবসায় সাহায্য করে সরকারি পুলিশবাহিনী। সেই পুলিশ নির্বিঘ্নে চোরা কারবার চালাতে দেয় মোটা ঘুষের বিনিময়ে। গল্পে দারোগা শশীকান্ত দেবীদাসকে চোরাকারবার চালাতে সাহায্য করার বিনিময়ে কখনো পায় টাকা, কখনো বা মূল্যবান আদ্দির কাপড়। তাইতো গল্পে দেখা যায় যেখানে কেরোসিনের অভাবে গ্রামগুলো অন্ধকারে তলিয়ে থাকে, যাত্রা উপলক্ষে পাঁচটা ডে লাইট জ্বালানোর ব্যবস্থা করেন দারোগা শশীকান্ত। এক মায়ের বুকফাটা কান্নার শব্দ ওঠে, তার ছেলেকে ঘর থেকে শেয়ালে নিয়ে যায়। ঘরের পিছনে শিশুটির অভুক্ত মাথা পড়ে আছে। ঘরের এত কাছে বসে খেয়েছে কিন্তু আলোর অভাবে শিশুটিকে বাঁচানো গেল না। সেই অন্ধকার গ্রামে পাঁচটা ডে লাইটের উজ্জ্বল আলোয় শুরু হয় যাত্রাপালা 'দুঃশাসনের রক্তপান'। বৈকুণ্ঠ অধিকারীর যাত্রা দলকে ভাড়া করে আনে শশীকান্ত, নিরন্ন, বস্ত্রহীন মানুষগুলোকে সে আপ্যায়ন করে বলে –

"ওরে বোস বোস তোরা ...দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তোদেরই তো গান, - তোদের জন্যই তো দেড়শো টাকা খরচ করে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দল আনলাম।"[১০]

দেড়শো টাকা দিয়ে বৈকুণ্ঠ অধিকারী দল এনেছে দারোগা, আর পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়েছে দেবীদাস। গ্রামের নিরন্ন বস্ত্রহীন মানুষগুলোকে যাত্রাপালা দেখানোর জন্য তাদের এই ব্যবস্থা নয়, সেই নিরন্নবস্ত্রহীন মানুষগুলোর পেটে ভাত নেই। তাই তাদের যাত্রাপালা মন দিয়ে দেখার কথা নয় কিন্তু তারা নির্বাক হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো পালা দেখেছে। দুঃশাসনের রক্ত, দ্রৌপদীর চোখে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুন সমস্ত কিছু দেখে মানুষগুলো নির্বাক হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। এই যাত্রা পালাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে গল্পে, দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা পূরণ, দুঃশাসনের রক্ত দেখে সেই নিরন্ন বস্ত্রহীন মানুষগুলো যেন নতুন কিছু ভাবতে শিখেছে, তারাও যেন অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার উপায় খুঁজে পেয়েছে।

যাত্রাপালা শেষ করে দেবীদাস ও গৌরদাস বাড়ি ফেরার পথে লক্ষ্মণ মুচির বাড়ির সামনে লক্ষ্মণ বলে ডাকলে-

"ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল - সে বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল ...মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই। কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[১১]

দেবীদাসের মতো এ যুগের দুঃশাসনের জন্যই আজ বাংলার ঘরে করে মা-বোনেরা বস্ত্রহীন। বাংলার বুকে সে জীবন্ত দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে যুগের বস্ত্রহরণ করে চলেছে সে। মানুষের লজ্জাকে নিষ্ঠুরভাবে পরিহাস করেছে সে বারবার। বাড়ি ফেরার পথে দেবীদাসের মুখটা শুকনো, রাত্রি জাগরণের জন্য নাকি ভয়ে সেটা স্পষ্ট না হলেও তার মনে চলছে দ্বন্দ্ব - এটা বোঝা যায়। দেবীদাসের মনের পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা যেমন গল্পে উল্লেখ নেই ঠিক তেমনি নিরন্ন বস্ত্রহীন মানুষগুলোর জেগে ওঠার কথাও গল্পে নেই। কিন্তু যাত্রাপালার সেই দ্রৌপদীর শপথ, ভীমসেনের দিক থেকে দুঃশাসনের বুকের রক্ত দিয়ে পাঞ্চালির অঙ্গীকার, দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞাপূরণ, দুঃশাসনের বুকে বিঁধছে ভীমের আর না, সেখান থেকে উঠছে রক্ত আর সেই রক্তে দ্রুপদ নন্দিনীর বেণীবন্ধনের সময় উপস্থিত। এই ঘটনা পরম্পরা বস্ত্রহীন মানুষগুলোর মনে বিরাট ঝড় তুলেছে - এটাই আশা করেছেন লেখক। তাইতো সেই মানুষগুলো নিঃশব্দে বাড়ি গিয়ে হেঁসোতে শান দিয়েছিল। যাত্রা দেখার পর লক্ষ্মণ মুচির বাড়ির সামনে বিবস্ত্র নারীকে দেখে দেবীদাস ভয় পেয়েছিল –

"রাত্রি জাগরণে দেবীদাসের মুখটা অদ্ভুত আর পাণ্ডুর। ওদিকে ফসলহীন রিক্তমাঠ। তারই ভাঙ্গা আলের ওপর দিয়ে একদল কাজ করতে চলেছে। তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠেছে। অকারণে অত্যন্ত বড়ো বেশি ভয় করতে লাগল দেবীদাসের। অমন করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা।"[১২]

দেবীদাসের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌরদাসের মনে উঠেছে প্রশ্ন যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে তাকেও কি মহাভারতের দুঃশাসনের মতো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? নাকি এ যুগে আর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না কারো। গৌরদাসের এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর নেই গল্পে। তবে গৌরদাসের মনে হয়েছে দারোগা শশীকান্তের লাল বাড়িটি যেমন বস্ত্রহীন নিরন্ন মানুষগুলো রক্ত দিয়ে বানানো ঠিক তেমনি দেবীদাসের সাদা বাড়িটাও এই মানুষগুলোর হাড় দিয়ে বানানো। লেখকের মতো গৌরদাসও যেন ভেবেছে মানুষগুলোর মনে ভীমের মতো প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠুক।

আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' দুটি গল্পের নামকরণের সার্থকতার পরিচয় পাই। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন বলেছিলেন সতীর অভিশাপে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সমস্ত ভস্মিভূত হয়ে যাবে, এ যুগের দ্রৌপদীদের অভিশাপ দেওয়ার ক্ষমতা নেই কিন্তু তাদের দীর্ঘশ্বাস চোখের জল অভিশাপ ডেকে আনবে - এই ছিল দুজন লেখকের মনোবাসনা। 'দুঃশাসনীয়' গল্পের রাবেয়ার জীবন দিয়ে প্রতিবাদ যেন সমস্ত নারীর প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'দুঃশাসন' গল্পের শশীকান্ত, দেবীদাস কিংবা 'দুঃশাসনীয়' গল্পের আব্দুল আজিজ, সুরেন ঘোষ সবাই দুঃশাসনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভীমসেনের বড় অভাব সমাজে। তবে আশাবাদী ছিলেন লেখকেরা, আশাবাদী সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাও নিশ্চয়ই একদিন ভীমসেন জাগবে আর এই দুঃশাসনের রাজত্ব শেষ হবে।

তথ্যসূত্র :

১. গাজী, রহিম আব্দুর, ‘যুগের প্রতিবিম্ব বাংলা ছোট গল্প’ (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ -২০০৬, পৃ. ৪২
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ‘রচনাসমগ্র’ (পঞ্চম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা -২০, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৭৩
৩. তদেব, পৃ. ১৭৭
৪. তদেব, পৃ. ১৭৭
৫. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, ‘কথাশিল্পী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ - ২০০৪, পৃ. ১৩০
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ‘রচনাসমগ্র’ (পঞ্চম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা -২০, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৭৩
৭. ঠাকুর, সুস্মিতা, ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প’ (দ্বিতীয় খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ -১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ‘রচনাবলী’ (দ্বিতীয় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ -১৪০৬, পৃ. ৩৭২
৯. তদেব, পৃ. ৩৭১
১০. তদেব,পৃ. ৩৭৪
১১. তদেব,পৃ. ৩৭৭
১২. তদেব,পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

আকর গ্রন্থ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, ‘রচনাসমগ্র’ (পঞ্চম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা -২০, প্রথম প্রকাশ
২. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, ‘রচনাবলী’ (দ্বিতীয় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ-১৪০৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য তপোধীর, 'কথাসাহিত্য: পুনঃপাঠ', দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা- ০৭, প্রথম প্রকাশ-২০১৫।
২. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা (তৃতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ- ২০১৬
৩. আচার্য অনিল, ‘সত্তর দশক’, অনুষ্টুপ, কলকাতা- ০৭, তৃতীয় সংস্করণ- ২০১৪
৪. ভট্টাচার্য দেবীপ্রসাদ, ‘উপন্যাসের কথা’, দে,'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম সংস্করণ-২০০৩
৫. ঘটক ঋত্বিককুমার, ‘চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু’, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১৮
৬. কুণ্ডু ড: চন্দন কুমার, ‘ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ বাংলা উপন্যাসের দর্পণে’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০১২
৭. সেন মণিকুন্তলা, ‘সেদিনের কথা’, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮২
৮. সিনহা হেনা, ‘বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ভগ্ননীড়ের বেদনা’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০১০

৯. বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, 'দেশভাগ-দেশত্যাগ', অনুষ্টুপ, কলকাতা- ০৭ প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৪
১০. ভট্টাচার্য তপোধীর, 'দেশভাগ : নির্বাসিতের আখ্যান', সোপান, কলকাতা- ০৬, প্রথম প্রকাশ- ২০১৬
১১. ভট্টাচার্য অধ্যাপক দেবাশীষ, 'বিশ শতকের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা', অক্ষর পাবলিকেশন, কলকাতা- ১২, প্রথম প্রকাশ- ২০১০
১২. নাথ প্রিয়কান্ত, 'কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০৭
১৩. মকসুদ সৈয়দ আবুল, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য (প্রথম খন্ড)', মিনার্ভা বুকস, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১
১৪. ওয়ালীউল্লাহ সৈয়দ, 'গল্পসমগ্র', প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা -১১০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০৫
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, 'রচনাসমগ্র' (পঞ্চম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা-২০, প্রথম প্রকাশ
১৬. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'রচনাবলী' (দ্বিতীয় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ-১৪০৬